বিএনপি ও বিবর্তনবাদ

বিজ্ঞানীরা চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদকে গত মিলেনিয়ামের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক থিওরী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এমনকি আইনষ্টাইনের সুবিখ্যাত রিলেটিভিটির সূত্রও হেরে গেছে বিবর্তনবাদের কাছে। বিখ্যাত এই থিওরীর মুল প্রতিপাদ্য হচ্ছে – ‘গ্রহ–নক্ষত্র–তারকাপুঞ্জ–জড়–জীব–ধর্ম–সমাজ এক কথায় এই বিশ্বব্রম্মান্ডের সবকিছু প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। সৃষ্টির আদ্যিকাল থেকে এই বিবর্তন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া হিসেবে এখনও তা চলছে, ভবিষ্যতেও চলবে। প্রকৃতির এই অমোঘ নিয়মের সাথে যে যতো বেশী খাপ খাইয়ে চলতে পারবে, সে টিকে থাকবে, যে পারবে না সে বিলুপ্ত হবে। মনুষ্য সমাজও এই বিবর্তনের ধারা থেকে মুক্ত নয়। রাজনীতি যেহেতু মানব সমাজেরই একটি সক্রিয় আচরণ, সুতরাং রাজনীতিতেও অবধারিতভাবে এই প্রাকৃতিক নিয়মের প্রভাব পড়বে – এটিই স্বাভাবিক। পাঠক, লক্ষ্য করুন– পঞ্চাশ ষাট দশকের রাজনীতির সাথে বর্তমান কালের রাজনীতির কতোই না প্রভেদ। সেকালের রাজনীতিবিদরা সারাজীবন রাজনীতি করে নিঃস্ব হতেন, বর্তমানকালের রাজনীতিবিদরা রাজনীতির কল্যানে নিঃস্ব অবস্থা হতে রাতারাতি কোটিপতি বনে যান। এরই নাম আর্থ–রাজনৈতিক বিবর্তন। এদেশে বিবর্তন প্রসেসের সাথে সবচেয়ে বেশী অভিযোজন করতে পেরেছে বিএনপি নামক দলটি। বিএনপি’র প্রধান প্রতিদ্বন্ধী আওয়ামী লীগ এক্ষেত্রে হাজার যোজন পেছনে। কীভাবে?

নীচের পয়েন্টগুলি বিবেচনা করে দেখুনঃ

(ক) জন্মতারিখের বিবর্তনঃ

১– বিএনপি’র চেয়ার–পার্সন আপোষহীন দেশনেত্রী ম্যাডাম খালেদা জিয়ার জন্ম তারিখ নিয়ে দেশবাসী চরম বিভ্রান্তিতে আছে। তার জন্মতারিখ আসলে কোনটি? তার জন্মদাতা জনাব ইসকান্দার মিয়ার ভাষ্যমতে তার কনিষ্ঠা কন্যা বেগম খালেদা খানমের জন্ম হয়েছিল ১৯৪৫ সালের ৫ই সেপ্টেম্বার, যেদিন ২য় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছিল ঠিক সেদিন (পাঠক মনে রাখবেন, মহামানব বা মহামানবীদের জন্ম সাধারনত বিশেষ দিনে হয়। চেরাগ আলী ছগিরালিদের মতো সবদিনে হয় না। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে ধরাধামে শান্তি আসল যেদিন, সেদিনটি নিঃসন্দেহে ম্যাডাম জিয়া নামক মহামানবীর জন্মগ্রহনের সবচেয়ে উপযুক্ত দিন)। কে কবে জন্ম নিয়েছে, তার সবচেয়ে বিশ্বস্ত স্বাক্ষী হচ্ছে বাপ–মা। সুতরাং ম্যাডামের প্রথম জন্মতারিখ যে সেপ্টেম্বার মাসে তাতে কেউ সন্দেহ পোষণ করবেন না আশা করি, যদিও রাজনৈতিক বিবর্তনের ফলে এই তারিখটি যে কোন সময় পরিবর্তনের হক রাখে।

২– এর পরের দৃশ্যটি ১৯৫৪ সালের, যেদিন তার পিতৃদেব তাকে দিনাজপুর সরকারী বিদ্যালয়ে ৪র্থ শ্রেনীতে ভর্তি করান। ম্যাডামের বয়েস তখন মাত্র নয় বছর, নাক দিয়ে সিনকি ঝরা বয়স। সেখানেও সিকান্দার মিয়া মেয়ের জন্ম তারিখ লিপবদ্ধ করান ৫ই সেপ্টেম্বার, তবে বয়েসটা এক বছর কমিয়ে ১৯৪৬ সাল করে দেন। আমাদের সমাজে এ এক প্রচলিত প্র্যাক্টিস, আমরা সবাই স্কুলের কাগজপত্রে বয়েস দু’এক বছর কমিয়ে দেই। লক্ষ্য করুন, এই পর্বে বিবর্তনের হার খুব বেশী নয়, নয় বছরে মাত্র এক বছর। তবে জন্মের মাসটিতে বিবর্তনের কোন ছোয়া লাগেনি, সেপ্টেম্বারের ৫ তারিখেই স্থির আছে সেটি।

৩– পরবতী পর্ব ১৯৭৮ সালের ১লা এপ্রিল, ম্যাডামের বয়েস তখন তিরিশের উপরে। জিয়াউর রহমানের সহধর্মিনী বেগম খালেদা খানম ঐদিন নিজের স্বাক্ষরে পাশপোর্টের আবেদন করেন। উক্ত আবেদনপত্রেও তিনি তার জন্ম তারিখ উল্লেখ করেন সেপ্টেম্বার, ১৯৪৬। লক্ষনীয়, এখন পর্য্যন্ত তার জন্মতারিখটি খুব বেশী বিবর্তনের শিকার হয়নি। কারণ সে সময় তিনি ছিলেন নিতান্তই একজন গৃহবধু, রাজনৈতিক বিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা ছিল না বললেই চলে।

৪– ১৯৯০ সালে এরশাদকে হটিয়ে আপোষহীন খেতাব অর্জন করেন ম্যাডাম এবং সেই খেতাবের লেজ ধরে একানব্বুইতে বাংলাদেশের সিংহাসনে আরোহন করেন। আর তখন থেকেই শুরু হয় বিবর্তনের নবতর পর্য্যায়, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যাকে বলা যায় বিবর্তনের উল্লম্ফন পর্ব (ইনফ্লেমেটরি ষ্টেজ)। সরকারী প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তার জন্মমাস এক মাস পিছিয়ে আনা হয়, সেপ্টেম্বার থেকে আগষ্টে। এই পর্য্যায়ে তার জন্মতারিখ নির্ধারণ করা হয় ১৯শে আগষ্ট, ১৯৪৫। এর কিছুদিন পর আরেকটি ঘোষণার মাধ্যমে তার জন্মতারিখ আরও ৪দিন পিছিয়ে এনে ১৫ই আগষ্ট ধার্য্য করা হয়।

সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত তাঁর জন্মদিন আর বিবর্তিত হয়নি, বিএনপি'র নেতাকর্মীরা প্রতি বছর ঐ দিনে হাস্যমুখে কেক কেটে নেত্রীর ফুলেল জন্মদিন পালন করার সুযোগ পেয়ে থাকে।

৫- এর বিপরীতে আওয়ামী শিবিরের চালচিত্র কীরুপ? বিবর্তন বলে একটা টার্ম যে ডিক্সনারিতে আছে, তাই তাদের জানা আছে বলে মনে হয় না। শেখ হাসিনা নামে কেউ একজন যখন আছেন তখন তার একটি জন্মদিনও থাকার কথা। অথচ যথাযথ বিবর্তনের অভাবে লোকে তা ভুলতে বসেছে। শেখ হাসিনার জন্মদিন যদি বিবর্তিত হয়ে মে মাসের তিরিশ তারিখে হতো (জিয়ার শাহাদত বার্ষিকীতে), ভাবুনতো কতো বড় মরাল এ্যাফেক্ট হতো? দামী শিফন আবরিত গোলাপী লিপষ্টিক চর্চিতা শেখ হাসিনা হাস্যমুখে বসে থাকতেন, নেতাকর্মীরা উৎসাহভরে কেকের বুকে ছুরি চালিয়ে উল্লাস প্রকাশ করতো। ছুরিকাঘাতে কেকেদের কতটুকু কষ্ট হয় তা এখনও আবিস্কৃত হয়নি, তবে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বুকে তা যে শেলসম আঘাত হানে- তা আওয়ামী লীগারদের চাইতে ভাল আর কে জানে? তার পরেও এই আইডিয়া কোন আওয়ামী লীগারের মনে স্বপ্নেও উদয় হয়েছে বলে মনে হয় না। কারণ- আগেই বলেছি - রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে বিবর্তন বিজ্ঞান প্রয়োগ করার বিদ্যা তাদের আদৌ জানা নেই।

কেউ কেউ হয়তো যুক্তি দেখাতে পারেন যে- ছিঃ ছিঃ, বাপমা বর্ণিত জন্মদিন আবার বদল হয় নাকি? তাদের কথার জবাবে বলতে হয় যে- আমাদের মতো সাধারণ জনদের জন্মদিন মা-বাপের ধার্য্যকৃত দিন থেকে বিচ্যুত হয় না এ কথা সত্য। তবে রাজনৈতিক নেতানেত্রীদের জন্মদিন শুধু বাপমা'র ধার্য্যকৃত দিনে স্থির থাকলে চলে না। তাদের বায়লজিকাল জন্মদিন কবে রাজনীতির দৃষ্টিতে সেটি বড় কথা নয়, বরং জন্মদিন কবে হলে দল তথা দলীয় রাজনীতির জন্যে ভালো হয় সেটিই বড় কথা।

(খ) ভাঙা সুটকেসের বিবর্তনঃ

একাশি সনে জিয়া যখন নিহত (কিংবা শহীদ) হন, তখন টেলিভিশনের পর্দায় খুব ঘটা করে একটি ভাঙা সুটকেস ও ছেড়া গেঞ্জী প্রদর্শিত হয়েছিল। যতদুর মনে পড়ে- একটা ৫৭০ সাবান এবং সস্তা বলাকা ব্লেডও প্রদর্শিত হয়েছিল। বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি হয়েও ব্যক্তিগতভাবে তিনি কতটুকু সৎ ছিলেন- জনমনে তা প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এই প্রদর্শনীর লক্ষ্য। একটি গেঞ্জী কেনার মতো সামর্থও জেনারেল জিয়ার ছিল না, একথা আমি বিশ্বাস করি না। তবে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ডিলসমুহে তিনি যে ব্যক্তিগত স্বার্থের চিন্তা করতেন না- একথা সবাই স্বীকার করেন। অর্থাৎ- জিয়াউর রহমান অর্থনৈতিক বিবর্তনবিদ্যায় ততটা পারদশী ছিলেন না। তবে সে ক্ষতি তার সুযোগ্য পত্নী এবং গুনধর ছেলেরা সুদে-আসলে পুষিয়ে নিয়েছে। মাত্র ১৫ বছর সময়কালে তাদের সুদক্ষ কারিগরীতে পৈত্রিক সুত্রে পাওয়া সেই ভাঙা সুটকেসটি বিবর্তিত হয়ে সোনার সুটকেসে রুপান্তরিত হয়েছে। সংবাদপত্রের রিপোর্টে যখন ছাপা হয় যে আমাদের গরীব দেশটিরই এক সোনার ছেলে বিশ্বের ৩৯তম ধনী, তখন গর্বে বুক ফুলে উঠে। বিবর্তনের এ কী অবিশ্বাস্য সাফল্য!

পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগের সাফল্য এ ক্ষেত্রে কতটুকু? ৩৯তম ধনী হওয়া দুরের কথা, হাসিনা-তনয় জয় দুই যুগেরও বেশী সময় পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশে বসবাস করেও কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপর এক টুকরো কাগজ ছাড়া তেমন কোন উল্লেখ্যযোগ্য অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জন করতে পেরেছে- এমন সুখবর দেশবাসী এখনও পায়নি।

মোট কথা হলো- রাজনৈতিক অঙ্গানের বিভিন্ন বিষয়াদিতে বিএনপি যেভাবে নিত্যনুতন কৌশল (যেমন স্বৈরাচার ও স্বামীহত্যাকারী আখ্যা দিয়ে কখনও এরশাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আপোষহীন খেতাব অর্জন, আবার পরক্ষনেই এসো এসো আমার ঘরে এসো বলে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরা), সময়েপযোগী মৌলিক রাজনৈতিক টার্ম উদ্ভাবন (যেমন দেশের ভাবমুর্তি, উন্নয়নের জোয়ার, ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি), রাজনৈতিক পরিভাষায় নুতন নুতন শব্দের সংযোজন (যেমন ইন্ডেমনিটি, ক্লিন হার্ট, ক্রস ফায়ার, এনকাউন্টার ইত্যাদি) করে জাতিকে একটি মাল্টি-ডাইমেনশনাল রাজনীতি উপহার দিতে সক্ষম হয়েছে- আওয়ামী লীগ যার ধারে কাছেও নেই। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, অসাম্প্রদায়িকতা, মুল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি অচল কিছু শব্দের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে পয়ত্রিশ বছর ধরে। বিশ্বায়ন শব্দের অর্থ হচ্ছে যে যেভাবে পার 'মাল্লু' কামাই কর। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিশ্রুতিশীল তরুনটি পর্য্যন্ত এই দর্শন লুফে নিয়েছে এবং বইখাতা ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করে মাল্লু কামাইয়ের ধান্দায়

চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজির মতো মহৎ কর্মকান্ডে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছে। মুল্যবোধ শব্দটির এতটাই বিবর্তন ঘটেছে যে প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে মরনোত্তর ফুলের তোড়া উপহার পায় সন্ত্রাসী সগিরালীরা, শামসুর রহমান কিংবা হুমায়ুন আজাদরা নয়। দেশের সর্বপ্রধান কবির মৃত্যুসংবাদ বিটিভি'র চোখে গুরুত্বপুর্ণ নয়, গুরুত্বপুর্ণ হচ্ছে ম্যাডামের নন্দীভৃঙ্গি লালুভুলু, আলালদুলাল, বুলুদুলুদের ভাষণ প্রচার। যে সমাজের সামগ্রিক চালচিত্র এরুপ, যে সমাজ শামসুর রহমানের মতো এত বড়ো মাপের একজন কবিকে মৃত্যুর পর সামান্য রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদাটুকু দিতে পারে না, সেই সমাজে মুল্যবোধ বা অসাম্প্রদায়িকতার মতো শব্দ উচ্চারণ কি বেনানান বিসদৃশ্য নয়?

বিবর্তনের ধারায় গা ভাসাতে না পারলে আওয়ামী লীগারদের কোন ভবিষ্যৎ আছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না।

ছগিরালি খান
১৭ই আগষ্ট- ২০০৬ সাল।
(তথ্যসুত্রঃ দৈনিক জনকন্ঠ, ১৫ই ও ১৬ই আগষ্ট, ২০০৬)